মেদিনীপুরের দিনগুলি

শতবর্ষের প্রাক্কালে গঙ্গাজলেই হোক গঙ্গাপুজো। স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ছবি আঁকার পাশাপাশি লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি অসামান্য বই। যার প্রায় সবগুলিই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সেই বইগুলিরই অন্যতম *কিছু বনফুল* (প্রকাশক আজকাল) নির্বাচিত অংশ। নির্বাচিত অংশটির শিরোনাম আমাদের হলেও লেখাটির বানান অপরিবর্তিত রাখা হল।

গত '৮৭ সালে আমার ইস্কুল (নারিকেলডাঙা হাই স্কুল) ১২৫তম বার্ষিকী পালন করল প্রাক্তনীদের মিলনোৎসবে। আমিও একজন আমন্ত্রিত ছিলাম সেখানে। তারপর উপহার বিতরণের দিন এল, সেদিন স্কুলের বর্তমান প্রধানশিক্ষক আমার অনুজপ্রতিম সমরেন্দ্র আমাকে আহ্বান করল মঞ্চে ওঠার জন্য। সে আহ্বানে আমি কিন্তু সত্যিই হকচকিয়ে গেছিলাম। কারণ মঞ্চে তখন স্কুলের ভূতপূর্ব সেরা সেরা ছাত্র, তাঁদের মধ্যে চিরকালের ব্যাক-বেঞ্চার আমি বর্তমানের খোঁড়া পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে মঞ্চে গিয়ে বসলাম। তারপর যখন পুরস্কার বিতরণ শুরু হল, সে সময়ে আমাকেও উপহার নিতে আহ্বান করা হল। তখন দেখলাম স্কুলের ১২৫ বছরের জীবনে অন্যতম সেরা ছাত্রের ট্রফিটি আমাকেই দেওয়া হল। বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম আমার সমসাময়িক ছাত্ররা কেউ হাইকোর্টের জজ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অধ্যাপক; সবাই কিন্তু আনন্দে-উল্লাসে অভিনন্দন জানাল। আমি কিছুটা অভিভূত অবস্থায়, বোকার মতো ফিরে গেলাম আমার চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট পেছনের চেয়ারটিতে।

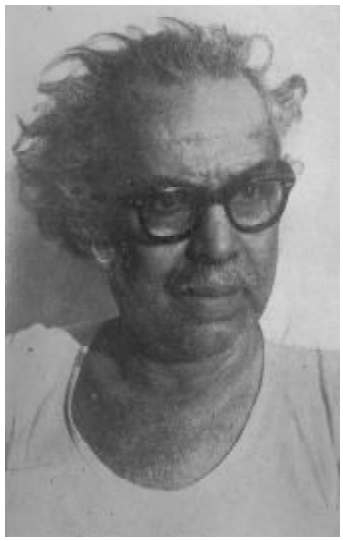

মনে পড়ছিল, আমায় এই সম্মানের অধিকারী যাঁরা করলেন তাঁরা আজ কেউই জীবিত নেই। কিন্তু তাঁরা যদি প্রতিদিন আমাকে কথার চাবুক মেরে উত্তেজিত না করতেন তবে আমার জীবনের এই ভালবাসা দুষ্প্রাপ্যই হয়ে থাকত। তাঁদের নেপথ্য আশীর্বাদেই আমি অকর্মণ্য বা অযোগ্য হইনি।

তিরিশের দশক এল। দেশের রাজনীতিতে জোয়ার লাগল। বাংলার যুবশক্তি রক্তস্নাত হল বারে বারে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আমার বিপ্লবী চেতনাও জাগ্রত হয়ে উঠল। বিদেশি শোষকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে। তখন আমরা আমার জন্মস্থান বাদুড়বাগান ছেড়ে বেলেঘাটার বাসিন্দা হয়ে গেছি। যেহেতু বেলেঘাটায় সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের খাদি

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার ফলে গান্ধীবাদী অহিংসবাদের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ছড়ানো ক্লাবগুলি নবসঙ্ঘ, নবমিলন, ভ্রাতৃ সম্মিলনী এরা সবাই ছিল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। আমার জীবনের অ্যাকশনের প্রথম ভূমিকা নবসঙ্ঘের দৌলতেই ঘটেছিল। বেলেঘাটার চুনোপটির গলিতে। পোস্টম্যান ডাকাতি। তখন আমার বয়স তেরো-চোদ্দো বছর। সেই পোস্টম্যানের কাছ থেকে (ইনসিওরড খামে) পাঁচ হাজার টাকার মতো পেয়েছিলাম। এবং সেই টাকা আমরা সুরেনদার হাতে এনে তুলে দিয়েছিলাম।

দীর্ঘ অসুস্থতার কাল কাটিয়ে আমি এলাম আমার পৈতৃক দেশ মেদিনীপুরে। সেখানে পৌঁছে দেখি মেদিনীপুর টগবগ করে ফুটছে। সদ্য তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে খুন হয়েছে। পেডি, ডগলাস ও বার্জ।

মেদিনীপুরের প্রথম বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন, যিনি এসেই কাজ শুরু করলেন বৈপ্লবিক চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক চেতনার দিকে। শুরু করলেন মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসদন। তার বিরাট সভাগৃহ, সামনের অংশে লাইব্রেরি ও ছোট সভাকক্ষ। সংগঠিত হল সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে চিত্রের গুণাগুণ বিচার করলেন বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু মহাশয়। এবং সেখানে সাদা-কালোয় আমার একটি ছবি *His Eterrnal Ledger* ছিল। জীবনে ওইটিই আমার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছবি। বাবার মৃত্যুর পর ছবিটি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। আজও তার জন্য আমার হা-হুতাশের অন্ত নেই। এই সাফল্যের ফলে আমি আমন্ত্রিত হই মেদিনীপুরে নির্মীয়মাণ বিদ্যাসাগর হলের দেওয়ালচিত্র আঁকার জন্য। বিশাল কাজ হলের। এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেদিনের তাবড় তাবড় শিল্পী। যেমন, শিল্পী গোপাল ঘোষ, বাসুদেব রায়, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, গৌর দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন। তার মধ্যে একমাত্র নাবালক এবং অনামী ছিলাম আমিই।

ওই বিদ্যাসাগর হল উদ্বোধন করতে আসেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং তিনি অতিথি হয়েছিলেন বিনয়বাবুর বাড়িতেই। কারণ বিনয়বাবুর স্ত্রী ছিলেন তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতমা। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভীষণভাবে ভঙ্গুর। তাই তাঁকে কয়েকদিন আগেই মেদিনীপুরে আনা হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ছায়াঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতিদিন সকালে হুইল চেয়ার ঠেলে বেড়াবার সুযোগ তখন আমিই পেয়েছিলাম।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আমার ছবির মাধ্যমে আমাকে চিনতেন, তাই মাঝে মাঝে ছোট ছোট টুকরো কথায় ছবির মর্মস্থলের খবর দিয়ে দিতেন। যাই হোক আমি যে কথা বলে এখানে থামব সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বিদ্যাসাগর

হলে উদ্বোধনী ভাষণ। তার কথাগুলি ভুলে গেছি তবে তার মর্মবাণী সেদিনের শ্রোতাদের মনে অনুরণন করে আজও এবং আমারও। সেদিন তিনি বাংলার মানুষদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এই কথা মানেন বলেই আমায় ডেকেছেন। যে ভাষাকে নির্ভর করে আমি বিশ্বকবি হয়েছি, সেই ভাষা আমার মুখে জুগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই জরাজীর্ণ শরীরে এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।' এটাই রবীন্দ্রনাথের শেষ জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ। মেদিনীপুরে আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী সরকারের অত্যাচারে বিধ্বস্ত বিপ্লবী দলকে পুনঃসংগঠিত করা। বিশেষ করে ছাত্র ফেডারেশন। স্বভাবতই মেদিনীপুরে তখন বিদেশি একটি যুবকের চলাফেরা খুবই দুষ্কর ছিল। তাই ওখানে পৌঁছনোর কয়েক দিনের মধ্যেই আমিও হলুদ কার্ডের বন্দী হই। হলুদ বা রেড কার্ড কিন্তু ফুটবল খেলার মাঠের মতো নয়। এই রেড কার্ড হোল্ডার হওয়া মানেই স্বাভাবিক জীবন থেকে বাইরে চলে যাওয়া। হলুদ কার্ড প্রাপকদের জীবনের একাকীত্ব পরিপূর্ণভাবে ত্যাজ্য ছিল। কারণ সর্বদাই একজন বা দু'জন সঙ্গী জানিত বা অজানিতভাবে সর্বদাই সঙ্গী হত। একমাত্র বাড়ির ভেতর ছাড়া। তবে আমার একটা সুবিধা বা অসুবিধা ছিল, সেই সময় আমার বাবার এক ভূতপূর্ব চেলা এক সময় যিনি স্বদেশি করতেন, পরবর্তীকালে তিনিই পুলিসের গুপ্তচর বিভাগের অফিসার হয়ে মেদিনীপুরে ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই তিনি বাবার কাছে আসতেন। এবং বাবাকে সাবধান করার জন্য। আমার সম্বন্ধে সেদিনের গুপ্তচর রিপোর্টটি বাবাকে শোনানোর জন্য। আমি প্রদ্যুৎদার (ডগলাস হত্যার নায়ক) বাড়িতে তার মা-দাদাদের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে গেলেও অথবা আমাদের বার্জ-হত্যার অন্যতম নায়ক নন্দদুলাল সিংহ, নরেন দাস ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অরুণ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে যিনি আমার ভগ্নিপতি হয়েছিলেন) এদের কারও সঙ্গে কোনও গোপন স্থানে দেখাশুনো বা গোপন মিটিং থাকলে তার প্রতিটি নিখুঁত বিবরণ বাবার কাছে পৌঁছে যেত। যাঁকে আমরা পারিবারিক সূত্রে জবাকাকা বলতাম তাঁর মাধ্যমে। এবং এই সব তথ্য বিতরণের পর জবাকাকা বাবাকে শেষ উপদেশ দিয়ে যেতেন যে দেবুকে ফলো করে আমরা অনেক গোপন তথ্য পেয়ে যাচ্ছি। কারণ দেবু বিদেশি। অতএব তুমি দেবুকে সরিয়ে দাও। ফলে রোজই রাতে বাবার কাছে আমার প্রাপ্য ছিল তীব্র তিরস্কার।

বাবা দুঃখ করে বলতেন, আমি এক নির্বোধ গাধার পিতা হয়ে দাঁড়ালাম। অবশ্য আমি বাবার নির্দেশেই পথ পরিবর্তন করে জবাকাকা ও তাঁর দলবলকেই বিপথে চালিত করতে পেরেছিলাম। বাবা বললেন, আগামী এক মাস শুধু ছবি এঁকে যা, যা শুধুই একমাত্র নিসর্গ। প্রতিদিন প্রত্যুষে বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। যা গোপ দুর্গে। নীলকুঠিতে। যা বিলেতি চক্রে। রেলব্রিজের ধারে। সেখানে তেলরঙে নিসর্গ আঁক। যতরকমভাবে পারিস। ফলোয়ারদের পরিশ্রান্ত করে তোল। যাতে তারা বিভ্রান্ত হয়। ক্রমেই কাজে অবহেলা করে। তোকে অনুসরণ না করে মাঝপথেই থেমে যায়। যাতে তারা বোঝে তুই শুধু ছবি এঁকেই

চলেছিস। এই রাস্তায় পুলিসকে বিভ্রান্ত করা মেদিনীপুরে খুবই দুষ্কর ছিল। কারণ মেদিনীপুরের কেরানিটোলায় অরবিন্দ-শিষ্য বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো (দাস) তখন পুরোপুরি সংসারী জীবনযাপন করছেন। ছেলে মানববাবুকে দিয়ে ফটোগ্রাফির স্টুডিও করে জাঁকিয়ে বসেছেন। তাই আর্টিস্টের ভাঁওতায় সেদিনের মেদিনীপুরের পুলিসের কাছে লুকোনো খুবই শক্ত ব্যাপার। বিপ্লব লুকোনো খুবই দুষ্কর ছিল, কারণ মুরারিপুকুর বোমা ট্রায়ালের মামলায় রাজসাক্ষী বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই-এর স্বীকৃতিতে সারা দেশই জানতে পেরেছিল, হেম কানুনগোর ফ্রান্স যাওয়ার উদ্দেশ্য কলা-শিক্ষা নয়, বোমা-শিক্ষা।

তারপরে দেওঘরের দিঘিরিয়া পাহাড়ের যশিডির দিকে পরীক্ষকের হাতেই বোমাটি ফেটে একটি সফল প্রয়াস অপপ্রয়াসে পরিণত হয়। তাই মেদিনীপুরের পুলিস খুবই সজাগ ছিল এ-সব চিত্রকর, নট ইত্যাদি শিল্পীদের বিষয়ে। তবু আমাকে এই পথই বেছে নিতে হল। তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য। অবশ্যই এ সময় যে ক'টি ছবি এঁকেছিলাম তার মধ্যে অনেকগুলিই ছবি হয়ে উঠেছিল, এবং যে ছবি আঁকতে পারিনি, সেগুলি আঁকতে পারলে আমার শিল্প-সাম্রাজ্য আরও সমৃদ্ধ হত।

চিত্র পরিচিতি : ১। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়; ২। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্কেচে রবীন্দ্রনাথ; ৩। গোপ নীলকুঠি, মেদিনীপুর।